বীজ আইন

সিদ্ধার্থ গুপ্ত

"এইসব গাছেদের পূর্ব পুরুষের প্রাণ
তুমি স্পর্শ করেছিলে হাত তুলে.....
....এক যুগ থেকে অন্য যুগে হাত রাখা
করতলে খোলা ক্ষেত নিজে থেকে উল্টেপাল্টে গিয়ে
লুপ্ত বীজ ঠেলে তোলে হাতের পাতার থেকে গাছ।"
(জয় গোস্বামী)

পার্ল এস বাক—এর উপন্যাসে বৃদ্ধ চীনা কৃষক, যে কাঁধের বাঁকের মধ্যে বহন করছিল তার নাতিকে, বলেছিল তার সঞ্চয়ের তাম্র মুদ্রায় সে এই দুর্ভিক্ষের দিনে নাতির জন্য খরিদ করবে এক পাত্র খাদ্য। কিন্তু রৌপ্য মুদ্রাটি সে সরিয়ে রেখে দেবে শস্য বীজ কেনবার জন্য—চূড়ান্ত খাদ্যাভাবেও তা ব্যয় করা যাবে না। কেননা আবার বৃষ্টি নামবে, ফুটিফাটা মাটি আবার হবে "নব অঙ্কুর জয়পতাকায় ধরাতল সমাকীর্ণ।" সেদিন কৃষকের প্রয়োজন হবে সেই বীজ ধান। এক অর্থে তার পৌত্রও তো বীজ, তার বংশের বীজ ধান। কিন্তু তার কৌম, তার সংস্কৃতি, তার উত্তরাধিকারকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে হলকর্ষণ তাকে করতেই হবে। রোপণ করতেই হবে সে বীজ। কেবল গোত্র বা বংশ নয়। মানব জাতির অস্তিত্বের সঙ্গে সংযুক্ত বীজের অধিকার। এ মহাবিশ্বের উৎসও তাই।

আদিম মানুষের উৎপাদন ছিল শিকার ও সংগ্রহ (Hunters & Gatherers)। পশুপাখির মাংস ও নিজে থেকে জন্মানো উদ্ভিদের কান্ড, মূল, পাতা, বীজ, ফুল-ফল এসবে তাদের গ্রাসাচ্ছাদন হত। এইসব খাদ্যের যোগান ছিল অনিশ্চিত, সংগ্রহ করে দীর্ঘদিন রাখাও যেত না। ফলে আদিম বনবাসী মানুষকে রোজ ছুটতে হত খাদ্যের পিছনে। আদিম যুগের হাতিয়ার ও পরে আগুনের ব্যবহার বাদে মানুষ তখন পশুরই সমতুল্য। মানুষের সমাজে প্রথম বিপ্লব ঘটল, যখন সে আবিষ্কার করল কৃষিকাজ আর পশুপালন। শুরু হল উদ্বৃত্ত উৎপাদন (Surplus Production)। এখন রোজ

আর মানুষকে খাদ্যের সন্ধানে বের হতে হয় না। অবসর সময়কে মানুষ কাজে লাগালো উৎপাদনকে আরও সুনিশ্চিত করার জন্য প্রাকৃতিক নিয়মাবলী খুঁজে বার করতে এবং তাকে জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর কাজে লাগাতে। এল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। সৃষ্টি হল সাহিত্য, শিল্প, ললিতকলা।

আজ মানুষ যে ধান, গম বা ভুট্টা চাষ করে-- প্রকৃতিতে সেসব এই আকারে ছিল না। তাদের বীজের দানা ছিল ছোট ছোট, আর পাকলেই তা ঝরে পড়ে যেত। ফলে সে ফসল চাষ করে, কেটে ঘরে আনা যেত না। বন্য প্রাকৃতিক শস্যকে পোষ মানিয়ে চাষযোগ্য করা, নানা জাতের ধান বা অন্য শস্যের উদ্ভাবন, বিভিন্ন গোত্রের ধান মিলিয়ে নতুন উন্নত প্রজাতির শস্য তৈরি করা, জলবায়ু ও ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারের ধরন অনুযায়ী ফসল নির্বাচন— এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হাজার হাজার বছর ধরে হয়ে এসেছে পৃথিবীতে। শুধু তাই নয়, কৃষিকে কেন্দ্র করে মৃৎপাত্র নির্মাণ, ধাতু নিষ্কাশন, আবহাওয়া সম্পর্কে জ্ঞান, বলবিদ্যার পাঠ, জৈব প্রযুক্তি, জ্যোতির্বিদ্যা (ঋতু ভাগ ও চন্দ্র-সূর্য-তারার সাহায্যে সময়ের মাপ নিয়ে পঞ্জিকা তৈরি) প্রভৃতি সব কিছুরই বিকাশ ঘটল। কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে উন্নত হল পশুপালনও। পরবর্তীতে কৃষির উদ্বৃত্তের ভিত্তিভূমিতে তৈরি হল যন্ত্র শিল্পের উপরিসৌধ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আরও বিকাশ। তাহলে কি দেখা যাচ্ছে? মানব সভ্যতার ইতিহাস এক কথায় কৃষির উদ্ভব, উন্নতি ও বিকাশের ইতিহাস। পৃথিবীর দেশে দেশে (বিশেষত কৃষিভিত্তিক পুরনো দুনিয়ার) সংস্কৃতি, লোকসাহিত্য ও শিল্পে কৃষি সমাজের ছাপ প্রকট। ধর্মের সঙ্গেও তা মিশে গেছে অঙ্গাঙ্গীভাবে।

মহেঞ্জোদাড়োর ধ্বংসাবশেষে মাটির পাত্রে শস্য দানার উপস্থিতি, মিশরের ভ্যালি অফ কিংস-এ ফারাওদের সমাধিতে স্বর্ণপাত্রে গমের বীজ, পেরুর ইনকা সভ্যতার প্রতিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ভুট্টার ব্যবহার এইসব কথাই মনে করায়।

ভারতবর্ষের কৃষির ইতিহাস পাঁচ হাজার বছরেরও বেশী পুরনো। বালুচিস্তানের কোয়েটার কাছে মেহরাগড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের দ্বারা নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের বসবাসের চিহ্ন পাওয়া গেছে, যা প্রায় ৭০০০ বছরের

প্রাচীন। এই মানুষেরা গম, যব, জোয়ার ও ধানের চাষ জানত। শস্য সংরক্ষণের জন্য মাটির পাত্র তৈরি করত। কোয়েটা ছাড়া সোয়াত উপত্যকা, কাশ্মীর, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং কৃষ্ণা-গোদাবরী অঞ্চলেও প্রাক্ ঐতিহাসিক মানুষের কৃষিকার্যের বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। খৃষ্টপূর্ব ৫০০০ থেকে খৃষ্টীয় ২০০০ সাল—এই বিপুল সময়ে ভারতীয় কৃষি পেরিয়ে এসেছে দীর্ঘ দীর্ঘ পথ। আজকে সারা দুনিয়ায় যেসব ফসলের বীজ পাওয়া যায়, তার অনেকটাই ভারতের কৃষকের দান। তারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গবেষণালব্ধ সম্পদ। আর আজ যারা দুনিয়াদারি করছে, তারা ডাঙ্কেল চুক্তি, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা মেধাস্বত্বের (TRIPS) হাতিয়ারে শান দিয়ে ভারতীয় কৃষকদের কাছ থেকে মানব সভ্যতার ঊষাকাল থেকে অর্জিত বীজের অধিকারই কেড়ে নিতে উদ্যত। পৃথিবীর ইতিহাসে এই অন্যায়ের জুড়ি মেলা ভার।

ভারতীয় কৃষির হাল হকিকৎ

প্রায় সাড়ে তেত্রিশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের দেশ আমাদের মাতৃভূমি। কৃষি জমির পরিমাণ ১৪৩০ লক্ষ হেক্টর (১ হেক্টর = ৭.৫ বিঘা)। মোট ভৌগোলিক এলাকার ৪৬.৬ শতাংশ কৃষি জমি—যা বিশ্বে সবচেয়ে বেশী। সরাসরি ২২ কোটি মানুষ কৃষিজীবী। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কৃষিতে কর্মসংস্থান হয় ৭০ শতাংশ মানুষের। কেবল কৃষির দ্বারা জীবনধারণ হয় ৬৩ শতাংশ ভারতবাসীর। অথচ কৃষি থেকে মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) ক্রমশ কমেছে। কমেছে কৃষি উৎপাদনও। কেন? কেননা কৃষিতে সরকারি লগ্নি নেই। জলসেচের আওতায় দেশের মাত্র ৪০% কৃষিজমি। বহু অঞ্চলের কৃষি আজও বর্ষার জলের ওপর নির্ভর (Rain Fed), আর দক্ষিণ ভারতের কিছু অঞ্চল ছাড়া বর্ষার মেয়াদ বছরে চার মাস। অথচ এ দেশের বিস্তীর্ণ জমি বহু ফসলি। এমনকি তিন-চারটি ফসলও ফলে—যা অন্য বহু দেশে অসম্ভব। ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার বহু জায়গায় তুষারপাত ও কুয়াশার জন্য সারা বছর চাষ করা যায় না। ভারতে ঠিক তার বিপরীত। ফসল ঘনত্ব (Crop Density) ১৫০ শতাংশেরও বেশী।

এবার দেখুন প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য ও খাদ্যশস্যে আমাদের স্থান কোথায়।

ফসল	২০০৬-'০৭ -এর মোট উৎপাদন (লক্ষ টন)	বিশ্বে স্থান	বিশ্বের উৎপাদনের শতাংশ
ধান	৯৩০	দ্বিতীয়	২০
গম	৭৫৩	দ্বিতীয়	১৮
মিলেট	১০৬	প্রথম	৩২
ডাল	১৪৫	প্রথম	২৫
চিনি	৩৫৫	দ্বিতীয়	২৩
চা	৯২ লক্ষ কেজি	দ্বিতীয়	২৮
তৈলবীজ	৩৫০	প্রথম	২৭

এছাড়াও বিশ্বের ১৭ শতাংশ দুধ, ৪১ শতাংশ আম, ৩০ শতাংশ ফুলকপি, ২৪ শতাংশ কাজুবাদাম, ৩৬ শতাংশ মটরশুঁটি ও বহু ফলমূলও উৎপাদিত হয় ভারতে।

ফসল বৈচিত্র্যে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে অগ্রগণ্য। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও (১৯৬৫-'৬৬ তে, তথাকথিত সবুজ বিপ্লব আরম্ভ হবার প্রাক্কালে) ভারতবর্ষে কয়েক হাজার প্রজাতির ধান পাওয়া যেত।

বহুজাতিকের তৈরি করা উচ্চ ফলনশীল বীজের (HYV) ধাক্কায় তা এসে দাঁড়িয়েছে ১২-১৩ টিতে। বাকি প্রজাতির বীজগুলি আর ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না। অথচ সংরক্ষণের নামে তা পাচার হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ায়। বলা হয়েছিল 'বিশ্বের সম্পদ' সঠিকভাবে সংরক্ষিত হবে। অথচ তা চলে গেল বেসরকারি কর্পোরেশনের হাতে।

সত্তরের দশকে খাদ্য সংকট দূর করার নামে আরম্ভ করা হয়েছিল প্রথম সবুজ বিপ্লব। উচ্চ ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক আর ডিজেলচালিত পাম্প চালিয়ে ভূগর্ভস্থ জল তুলে নেওয়া—কারণ দেশের বহু স্থানেই সেচ খাল ছিল না। প্রথম সবুজ বিপ্লব সংগঠিত করা শুরু হয় মেক্সিকো থেকে। তখন রকফেলার ফাউণ্ডেশন-এর উদ্যোগে, মার্কিন কৃষি দপ্তর এবং ইউ এস এইড -এর সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় গম ও ভুট্টার গবেষণা কেন্দ্র —সি এম এম ওয়াই টি। এরপর ফিলিপিনস্-এ স্থাপিত হল আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্র (IRRC) । নানা উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম কাজ ছিল এমন সংকর বীজ তৈরি করা যা, প্রচুর নাইট্রোজেন সার গিলে মোটা হতে পারবে। ইন্দোনেশিয়ার পেটা (Peta) ও চিনের ডি-গিও-উ গেন (Deæ-geo-woo gen) এই দুই ধানের সংকর থেকে তৈরি হল আই আর ৮। চলল নানা গবেষণা। বীজ কোম্পানির দখলদারির সেই হল শুরু। মেক্সিকোর উন্নত সেচ এলাকায় উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ফিলিপিন্স, ইন্দোনেশিয়া ও চীনের বীজের সংকর ঘটিয়ে HYV উৎপাদন বৃদ্ধির প্রকল্পই হয়ে দাঁড়াল মার্কিন শাসককুলের কাছে উন্নয়নশীল দেশে উন্নতির সাধারণ মডেল।

বীজ ও কৃষি

সম্ভবত কৃষির সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন হল বীজ। বীজের একটা বৈশিষ্ট্য —এটা একইসঙ্গে কৃষির উপাদান আবার কৃষির ফসল। বীজ থেকে ফসল, আবার ফসল থেকে বীজ —এই চক্রাকার পথে কৃষি চলেছে জন্মলগ্ন থেকে। বীজের উৎপাদন, সংরক্ষণ, উন্নয়ন —সবই কৃষকেরা করেন তাঁদের স্থানীয় পরম্পরার জ্ঞান দিয়ে। প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটা বীজ স্থানীয় পরিবেশের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। বহুদিন ধরে চলে আসা পদ্ধতিতে তৈরি বীজের ফলনের সম্ভাবনায় জলের অভাব, মাটির উর্বরতা, পোকা, রোগ, আগাছা বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। কোনও ধান হয় পাহাড়ের কোলে অল্প জলে (High land variety)। কোনোটা হয় বাদা অঞ্চলে গলা ডোবা জলে (Low land variety)। স্থানীয় এইসব বিষয়ের প্রেক্ষিতেই স্থানীয় বীজ নির্বাচন

করা হয়। তাই প্রতিটি বীজেরই একটা ইতিহাস থাকে। প্রতিটি বীজই কৃষি সংস্কৃতির অঙ্গ।

এই প্রেক্ষিত থাকে না বাইরের তৈরি বীজে। মনস্যান্টো, সিনজেণ্টা, কার্গিলের ব্যবসায়িক বীজে, বংশাণু পরিবর্তিত (Genetically Modified) বীজে। সে সব বীজ স্থানীয় জমি, জলবায়ু, কৃষকের বংশানুক্রমিক জ্ঞান নিরপেক্ষ। কৃষি জমির চরিত্র সম্পর্কে উদাসীন। কৃষি অঞ্চলের ভূগোল, অর্থনীতি, সংস্কৃতিতে তার কিছু যায় আসে না। হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা পদ্ধতি, বীজ জমিয়ে রাখা, উন্নত করা, বিনিময় করা, বাজারে বিক্রি করা, ব্যবহার করা— এই প্রক্রিয়াতেই আঘাত হানে বহুজাতিক দানব, কর্পোরেট দুনিয়া। উচ্চ ফলনশীল বীজ, টার্মিনেটর বীজ, জি এম বীজ ধ্বংস করে দিতে থাকে দেশের বীজ বৈচিত্র্যকে, ফসল বৈচিত্র্যকে। আর সেই ধ্বংসেই সরকারি সীলমোহর লাগাতে উদ্যত নতুন **বীজ আইন**। কেমন করে? পরবর্তী অধ্যায়ে তা বলছি।

প্রত্যেক কৃষক তার বীজ রোদে শুকোন, ঝাড়েন, বাছেন, পরিষ্কার করেন, আলাদা করেন, প্রয়োজনে সিদ্ধ করেন, বিক্রি বা বিনিময় করেন অন্য কৃষকের সঙ্গে। একে বলে প্রক্রিয়াকরণ। এই প্রক্রিয়াকরণকে আইনি নিগড়ে বাঁধতে চায় বীজ আইন। সবুজ বিপ্লবের অন্য উপাদান কৃষকের হাতছাড়া হলেও বীজটা তার হাতেই ছিল। সবুজ বিপ্লবে ভারতীয় কৃষি গবেষণাগারে বীজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। কৃষক বীজ নিজে ফলিয়েছেন, ব্যবহার করেছেন। আজ 'দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব' যা তথাকথিত 'চিরসবুজ বিপ্লব' (Ever green revolution) কৃষকের সেই অধিকার হরণে উদ্যত। কৃষক ও বীজকে আলাদা করে দিতে চায় সে। বীজ হবে পরাধীন, বহুজাতিক কোম্পানির রাসায়নিক 'রাউণ্ড আপ' ছাড়া তার ঘুম ভাঙবে না।

পাশ্চাত্যে কৃষক ও বীজ উৎপাদক আলাদা। বীজ উৎপাদন করে বড় বড় কোম্পানিগুলো। ১৯৬০-৭০' —এর দশক ছিল পেট্রো রসায়ন শিল্পের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে নানা মারণ গ্যাস বা যুদ্ধের রাসায়নিক উৎপাদক বহুজাতিক দানবেরা রাতারাতি ভোল পাল্টে হয়ে উঠল কীটনাশক উৎপাদক, রাসায়নিক সার উৎপাদক। তাদের বিপুল উৎপাদন ক্ষমতায় (যা তৈরি

হয়েছিল বিশ্বযুদ্ধে মানুষ মারার প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে) উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার তৈরির জন্য তৃতীয় বিশ্বে সংগঠিত করা হল সবুজ বিপ্লবের—যার মূল্য আজ চার পাঁচ দশক পরে কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিতে হচ্ছে। জমির উর্বরতা ধ্বংস, পরিবেশ দূষণ, ভূগর্ভস্থ জলের স্তর অনেক নেমে যাওয়া, জীবদেহে ক্যান্সারসহ নানা অসুখ, এমনকি মাতৃদুগ্ধও বিষিয়ে যাওয়া।

মারাত্মক দূষণ সৃষ্টিকারী পেট্রো রসায়ন-কীটনাশক শিল্প সম্পর্কে দেশে দেশে তুমুল প্রতিবাদ জেগে উঠতে লাগল। চতুর পুঁজিবাদও ভোল পাল্টে, লগ্নির ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিল জৈব প্রযুক্তিকে-- বায়োকেমিস্ট্রি, বায়োফিজিক্স, মলিক্যুলার বায়োলজি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। বিগত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে রাসায়নিক দানব কোম্পানি এবং কৃষি ও বীজের একচেটিয়া কারবারিদের মধ্যে সংযুক্তিকরণ শুরু হয়। যেমন, পাইওনিয়ার হাইব্রিড ও ডুপণ্ট (১৯৯৭), নোভার্টিস এ জি ও অ্যাস্ট্রা জেনেকা (২০০২), ডাউ এবং রোহম অ্যাণ্ড হ্যাস (২০০১) ইত্যাদি। সংযুক্ত দানবেরা নেমে পড়ল বীজের তথা কৃষির বাজারের ওপর একচ্ছত্র অধিকার কায়েম করতে- যাতে তৃতীয় বিশ্বের কৃষকেরা বীজ সংরক্ষণ করতে না পারে, যাতে প্রতি বছরই মনস্যান্টো (বা তার ভারতীয় অবতার মাহাইকো), সিনজেন্টা, ডুপণ্ট বা কার্গিল থেকে বিপুল দামে বীজ কিনতে হয় এবং এই পথে দেশে দেশে বীজ ও ফসলের বাজার একচেটিয়া পুঁজির করতলগত হয়। ফলে ভারতবর্ষে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্য বীজের একচেটিয়া দখল। হাতিয়ার বংশাণু পরিবর্তিত (GM) বীজ। এই কাজে তাদের প্রধান সহায়ক ২০০৫ সালে ভারতীয় সংসদে পাশ হওয়া নয়া পেটেণ্ট বা মেধাস্বত্ব আইন। দ্বিতীয় সহায় প্রস্তাবিত 'বীজ আইন ২০০৪/২০১০'। প্রথম সবুজ বিপ্লবে সংকর বীজের দাপটেও কৃষক বীজের অধিকার পুরোপুরি হারাননি। আজ উন্নততর প্রজাতির বীজ ও নিবন্ধীকরণ (Registration)-এর নামে আবহমানকাল ধরে চলে আসা বীজ থেকে শস্য, শস্য থেকে বীজ এই প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলা হচ্ছে। যেখানে বাঁজা প্রযুক্তি (Terminator Technology) রয়েছে সেখানে তার মারফতই দখলদারি। যেসব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তা নেই, সেখানে 'বীজ আইন'। এই হল সাম্রাজ্যবাদের পরিকল্পনা।

বীজ বিল ২০০৪ ও ২০১০

২০০৪ সালে এই বিল রাজ্যসভায় পেশ করা হয়। বিল এখনও আইনে পরিণত হয়নি। সম্প্রতি ক্যাবিনেট কমিটি তা অনুমোদন করেছে। সরকারের মনোগত বাসনা ঐ বিলকে যথাসম্ভব দ্রুত আইনে পরিণত করা। কারণ ঐ আইন করার জন্য আন্তর্জাতিক দুনিয়ার, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি ও বীজের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত কর্পোরেট হাউসগুলির প্রবল চাপ। মূল বীজ বিলে পরে কৃষি মন্ত্রকের দ্বারাই ৭১ টি সংশোধনী আনা হয়। আমরা সেগুলিও আলোচনা করব। মূল বিলটির খসড়া দশটি অধ্যায় এবং ৪৯ টি উপধারায় বিভক্ত।

প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, এই আইন প্রযুক্ত হবে বীজ ব্যবসায়ীদের জন্য এবং বীজ উৎপাদন করেন এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্য, যিনি বীজ বিক্রি করবেন (নিজের ব্যবহারের জন্য উৎপাদনকে বাদ দেওয়া হয়েছে)। এরপর অনেকগুলি ব্যবহৃত শব্দের অর্থের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন, কৃষির মধ্যে ফুল ফলের চাষ, বনজ সম্পদ (Forestry), বাগিচা চাষ (Plantation), ঔষধির (Medicinal Plants) চাষ সবই পড়ছে।

বীজ ব্যবসায়ী (Dealer) বলতে বোঝানো হয়েছে যে ব্যক্তি বীজ কেনাবেচা, আমদানি-রপ্তানি করেন বা এমন ব্যক্তির প্রতিনিধিকে।

সমস্ত প্রস্তাবিত আইনের মতই ঐ বিলের বিভিন্ন ধারা উপধারায় ব্যবহৃত সব ধরনের পদ (Term) কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়। সংশোধনী (Amendments)- তে বলা হয়েছে ঐতিহ্যগত বা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা (Traditional) প্রজাতিগুলির বীজের সংরক্ষণ বা তার উন্নতি ঘটানোও (Value addition) এই আইনের আওতায় পড়বে।

মূল প্রস্তাবে ছিল কৃষকও যদি তাঁর বীজ বপন, বিনিময় বা বিক্রি করতে চান তাহলেও তাঁকে নাম নথিভুক্ত করতে হবে এবং ঐ বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম ও শুদ্ধতা সম্পর্কে ন্যূনতম মান নিশ্চিত করতে হবে। ঐসব তথ্য কৌটোর গায়ে লেখা থাকতে হবে। অর্থাৎ, কৃষক নিজের বীজও বুনতে, বিনিময় বা বিক্রি করতে পারবেন না।

পরে প্রবল ধিক্কার ও সমালোচনার মধ্যে এক পা পিছু হেঁটে কৃষকদের ছাড় দেওয়া হল। তবে বলা হল কোনও বাণিজ্যিক নামে (Brand name) বিনিময় বা বিক্রি করা চলবে না। করলে জেল জরিমানা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে, নিবন্ধীকরণ (Registration) ও নজরদারির (Supervision) জন্য কেন্দ্রীয় বীজ সমিতি (Central Seed Committee) গড়ে তোলা হবে। কেন্দ্রীয় কৃষি সচিব হবেন পদাধিকার বলে সভাপতি। অন্যান্য সদস্যরা কৃষির সঙ্গে যুক্ত নানা আমলা।

প্রদেশগুলি থেকে পাঁচজন প্রতিনিধি থাকবেন। তাঁরা হলেন পাঁচটি ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে যে কোনও তিনটি অঞ্চলভুক্ত পাঁচ রাজ্যের পাঁচ কৃষি সচিব। অন্যান্য প্রদেশগুলি থেকে কৃষি নিগমের বিভিন্ন আমলা প্রতিনিধিত্ব করবেন। এছাড়াও দুজন কৃষক, বীজ বিক্রেতা সংস্থার দুই প্রতিনিধি ও দুজন কৃষি বিশেষজ্ঞ থাকবেন। এই কমিটি বীজ উৎপাদনের পরিকল্পনা, আমদানি-রপ্তানি, গুণমান (Quality) নিয়ন্ত্রণ, বীজ পরীক্ষা ও নিবন্ধীকরণ (Registration)-এর কাজ দেখবে। এই কমিটি বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম (Germination)-এর সময়, বংশানুগত (Genetic) ও দৈহিক (Physical) বিশুদ্ধতা ইত্যাদির মান নির্দিষ্ট করে দেবে। ঐসব তথ্য বীজের কৌটোর লেবেল (Label)-এ পরিষ্কার ভাবে লেখা থাকতে হবে। ঐসব তথ্যের প্রেক্ষিতে, কেমন ফসল আশা করা যায় তাও লেখা থাকা দরকার।

একটি বীজ নিবন্ধীকরণ (Registration) উপসমিতি তৈরি হবে এবং তার অধীনে বীজকে শংসায়িত (Certification) করার জন্য আরও একটি উপসমিতি তৈরি হবে।

রাজ্যে রাজ্যে গড়ে তোলা হবে রাজ্য বীজ কমিটি।

তৃতীয় অধ্যায়টি হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বলা হয়েছে—

ক. বীজের জাতীয় তালিকা (National Register of Seed) তৈরি করা হবে।

খ. ঐ তালিকায় নিবন্ধীকরণ না করে কোনওরকম বীজ বিক্রি করা যাবে না।

গ. প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিবন্ধীকরণ উপসমিতি কোনও বীজকে

তালিকাভুক্ত করতেও পারে বা নাও পারে।

ঘ. চালু বীজগুলির ক্ষেত্রে (যা বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে) সাময়িকভাবে নথিবদ্ধ (Provisional Registration) করা যাবে।

ঙ. নথিবদ্ধ থাকার সময়সীমা হল বার্ষিক / দ্বিবার্ষিক ফসলের ক্ষেত্রে ১০ বছর ও দীর্ঘকালীন ফসলের ক্ষেত্রে ১২ বছর।

চ. বংশাণু পরিবর্তিত (Transgenic) বীজ নথিবদ্ধ করার জন্য 'পরিবেশ রক্ষা আইন' (১৯৮৬) মোতাবেক ছাড়পত্র চাই।
[মূল দলিলে সাময়িক (Provisional) নিবন্ধীকরণের কথা বলা হলেও সংশোধনীতে তা প্রত্যাহার করা হয়]।

ছ. মানুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদের স্বাস্থ্যের পক্ষে সম্ভাব্য ক্ষতিকারক বীজকে নথিভুক্ত করা হবে না।

জ. নথিভুক্ত বীজের ক্ষেত্রে উৎপাদক বা বিক্রেতাকে কৃষকদের জানাতে হবে যে, কোন নির্দিষ্ট পরিবেশে (Given Condition) ঐ বীজ থেকে কেমন ফসল উৎপাদন হতে পারে। তা না হলে কৃষক ক্রেতা সুরক্ষা আইনে উৎপাদক, বণ্টনকারী বা বিক্রেতার থেকে ক্ষতিপূরণ চাইতে পারেন।

ঝ. অনথিভুক্ত বীজ কোনওভাবেই ব্যবহার করা চলবে না। বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রগুলি (Seed Processing Units)- কেও নথিভুক্ত হতে হবে।

ঞ. বীজ উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রগুলিকে নির্দিষ্ট সময়ে তাদের উৎপাদিত বীজের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিতে হবে। বীজ সংক্রান্ত যে কোনও ধরনের ব্যবসায় যুক্ত ব্যক্তি বা সংস্থাকে অবশ্যই নাম নথিভুক্ত করে শংসাপত্র নিতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে— বীজের ন্যূনতম মান (অঙ্কুরোদ্‌গম ও বিশুদ্ধতা) না থাকলে কোনও বীজই সংরক্ষণ, বিনিময় বা বিক্রি করা যাবে না।

খসড়া দলিলে বলা হয়েছিল কোনও বীজকে শংসাপত্র দেবার অধিকার রাজ্য বীজ কমিটির হাতে থাকলেও, অন্য কোনও অনুমোদিত সংস্থা থেকেও তা নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সংশোধিত প্রস্তাবে পরিষ্কার

বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারি সংস্থা ছাড়া অন্য কোনও শংসাপত্র গ্রাহ্য হবে না।

পঞ্চম অধ্যায়ে আছে, কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সুযোগ।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে 'বীজ পরীক্ষণাগার' (Seed Testing Laboratory) গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। এরপর বিপুল ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বীজ পরিদর্শক (Seed Inspectors)-দের। তারা যে কোনও সময়ে বীজ বিক্রি বা সরবরাহ করছেন এমন ব্যক্তির কাছ থেকে বীজের নমুনা সংগ্রহ বা আটক করতে পারেন এবং তা পরীক্ষার জন্য পাঠাতে পারেন। আইন লঙঘন করা হয়েছে 'মনে করলে' ঐ পরিদর্শক নিজে অথবা পুলিশি সহায়তা নিয়ে এই সংক্রান্ত যে কোনও জায়গায় প্রবেশ ও তল্লাশি চালাতে পারেন, বীজের সংগ্রহ বা এই সংক্রান্ত যে কোনও নথিপত্র পরীক্ষা বা আটক করতে পারেন। পরিদর্শকরা বীজের কৌটো ভাঙতে পারেন, এমনকি বীজ সংরক্ষণ করা হয়েছে এমন কোনও জায়গায় দরজা ভেঙেও ঢুকতে পারেন (Break open any container/ break open the door of any premises, where any such seed may be kept for sale)। এইসব ক্ষেত্রে 'অপরাধী'-র বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করা হবে।

খসড়া প্রস্তাবে ছিল বীজ পরিদর্শকদের এইসব কাজ করার জন্য আগে থেকে নোটিশ দেবার কোনও প্রয়োজন নেই। কেবল বীজ নিয়ে বেআইনি কাজকর্ম করা হচ্ছে, এমন সন্দেহই যথেষ্ট (প্রায় নিবর্তনমূলক আটক আইন বা ইউ. এ. পি. এ.-র মতই ভয়াবহ)। সংশোধিত প্রস্তাবে অবশ্য কোনও জায়গায় হানা দেবার আগে জেলাশাসকের অনুমতি নেবার কথা বলা হয়েছে।

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বীজের আমদানি ও রপ্তানি, আইন লঙঘন করার শাস্তি, কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্ন মানের বীজ বিক্রয় করার জন্য ৫০০০ থেকে ৩০০০০ টাকা আর্থিক জরিমানাএবং বীজ সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দেবার জন্য ছয় মাস পর্যন্ত হাজতবাস এবং / অথবা ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। সংক্ষেপে এই হল প্রস্তাবিত বীজ আইনের চুম্বকসার।

কেন আমরা এই আইনের বিরোধিতা করি?

১. মূল খসড়ার পরিবর্তন ঘটিয়ে কৃষকের বীজ সংরক্ষণ, ব্যবহার, বিনিময় ও বিক্রির অধিকার বজায় রাখা হয়েছে, যদি না-

ক. কৃষক ঐ বীজ কোনও বাণিজ্যিক নাম (Brand Name)-এ ব্যবহার, বিনিময় বা বিক্রয় করেন।

খ. যদি না ঐ বীজ অঙ্কুরোদ্‌গম এবং শুদ্ধতা (Physical & Genetic purity) সংক্রান্ত নির্দিষ্ট গুণমানের অধিকারী হয়।

ভাল ভাল কথার মোড়কে বিষাক্ত হুল লুকিয়ে রাখা হল এই ধরনের সরকারি দলিলের কারসাজি। একজন কৃষক বহুদিন ধরে পরম্পরাগতভাবে যে বীজ সংরক্ষণ বা ব্যবহার করে আসছেন -- তার গুণগত মান, বংশাণুগত (Genetic)ও দৈহিক (Physical) শুদ্ধতা সম্পর্কে গ্যারান্টি দেবেন কিভাবে? সেই পরিকাঠামো, পুঁথিগত জ্ঞান, অর্থবল বা সম্বল কি একজন গ্রামের সাধারণ কৃষকের আছে? বীজ বিক্রির ক্ষেত্রে 'অঙ্কুরোদ্‌গম' এবং 'শুদ্ধতা' সম্পর্কিত ন্যূনতম মানের শর্ত দেবার অর্থই হল স্থানীয় কৃষক অথবা দেশীয় ছোট বীজ কোম্পানিগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া, বহুজাতিকের ব্যবসা ফলাও করা এবং দেশীয় কোম্পানিগুলির চলে যাওয়া বহুজাতিক দানবদের গর্ভে। যেমন মাহাইকো (Maharashtra Hybrid Corp)-কে গিলে খেয়েছে মনস্যান্টো। অথচ মনস্যান্টোর বিক্রি করা বিটি তুলার বীজ (Bt Cotton)-এ বারবার ফসল না ফললেও (Crop Failure) অঙ্কুরোদ্‌গমের ঘোষিত সময় ও শুদ্ধতা না থাকার কারণে কোম্পানির কোনও শাস্তি হয় না। বিদর্ভে চড়া দামে বীজ ও চাষের অনুষঙ্গ কিনে ফসল না ফলায়, ব্যাঙ্ক বা মহাজনী ঋণ শোধ করতে না পেরে হাজার হাজার বিটি তুলা চাষি আত্মহত্যা করলেও (২০০৫-০৬ সালেই মোট আত্মহত্যার সংখ্যা ছিল চার হাজারেরও বেশী) মনস্যান্টোর বীজের 'শুদ্ধতা' নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না।

২. এই আইনের বলে দেশীয় বীজের উৎপাদন, প্রসার ও ব্যবহার সম্পূর্ণ রুদ্ধ হবে, কেননা স্থানীয় স্তরে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এইসব বীজ যাঁরা ব্যবহার করেন---তাঁদের ক্ষমতা নেই জিনঘটিত শুদ্ধতার শংসাপত্র জোগাড় করা। কালক্রমে হয় এসব বীজ অবলুপ্ত হবে, নচেৎ বহুজাতিকের হাত ধরে

পাড়ি জমাবে মার্কিন দেশে। সেখানে দু-একটি জিন পরিবর্তন করে, সুদৃশ্য মোড়কে করে, তার ওপর বংশ পরিচয়, ঠিকুজি লিখে ফিরে আসবে ভারতের চাষির কাছে, অবশ্যই কয়েক হাজার গুণ বেশী দামে। বীজের জন্ম কৃষির মাঠ বা বীজতলা থেকে চলে গেল গবেষণাগারে। জাতীয় বীজের পথ হল রুদ্ধ। আরও বেশী রাসায়নিক সার, কীটনাশক এমনকি 'Round up'-এর মত রাসায়নিক না হলে বহুজাতিকের বীজের ঘুম ভাঙবে না। ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে হাজার বছর ধরে চলে আসা দেশীয় বীজের ক্ষুদ্র ব্যবসা এখন মৃতপ্রায়। এবার চিরতরে তার অন্তর্জলী যাত্রা ঘটবে।

৩. 'Traditional Variety' গুলির সংরক্ষণ বা উন্নতি ঘটানোও (value addition) এই আইনের আওতায় পড়বে। কেন? মনস্যান্টোর জন্মের হাজার হাজার বছর আগে থেকে এইসব বীজ ভারতবর্ষে চলছে। এসব কোনও ব্যক্তির আবিষ্কার নয়, সমগ্র কৃষক সমাজেরই আবিষ্কার। আজ তাকে পেটেন্ট বা মেধাস্বত্বের আওতায় নিয়ে আসা চূড়ান্ত অনৈতিক।

৪. কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে যে বীজ কমিটি গড়ে তোলা হবে, তাতে কৃষকদের প্রতিনিধিত্ব ন্যূনতম। সরকারি আমলাদের দ্বারা বহুজাতিক কোম্পানিদের স্বার্থই রক্ষিত হবে, কৃষকদের নয়।

৫. বলা হয়েছে, মানুষ ও জীবজন্তু এবং উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকারক কোনও বংশাণু পরিবর্তিত বীজকে নথিবদ্ধ করা হবে না। এইসব বীজের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলগুলি মিথ্যাচারে ভর্তি। কোম্পানিগুলির সরবরাহ করা তথ্য সরকারি আধিকারিকরা বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করেন। আর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক কিনা তা বুঝতে বহু সময় লাগে। বহুজাতিক বীজ কোম্পানিগুলি নিষিদ্ধ বা ক্ষতিকারক ওষুধের মতই বিদেশে ক্ষতিকারক প্রমাণিত বীজকেও এদেশে বিক্রি করবে তথ্য গোপন করে (উদাহরণ : বিটি বেগুন সম্পর্কীত ঘটনাবলী ও উৎকোচের বিনিময় বিশেষজ্ঞদের কিনে নেওয়া)। তার প্রতিকার কি? বিটি তুলা, বেগুন, টমেটো, আলু বা ক্যানোলা থেকে যে ইতর পরাগ সংযোগ হয়ে (Cross Pollination) সমস্ত দেশীয় জিনমণ্ডলীই দূষিত হয়ে যাবে, তার কোনও প্রতিকার এই আইনে আছে কি?

৬. ২০০৬ সালে কৃষি বিষয়ক সংসদীয় কমিটি (রামগোপাল যাদবের নেতৃত্বে) যে সব আমূল পরিবর্তনের সুপারিশ করেছিলেন এই বিলের ক্ষেত্রে, তার কোনটিই মানা হয়নি। কৃষক সংগঠনগুলি একবাক্যে জানিয়েছে যে, এই বিল বহুজাতিকদের মুখ চেয়ে করা। সংসদীয় কমিটি প্রস্তাব দিয়েছিল যে, বীজের সঠিক দাম নির্ধারণের জন্য একটি জাতীয় কমিশন গঠন করা উচিত। তা মানা হয়নি। ফলে বীজের লাগামছাড়া দাম নির্ধারণে কোনও সরকারি নিয়ন্ত্রণ নেই। ভেজাল বীজ সরবরাহের জন্য ক্ষতিপূরণ বাড়িয়ে ১০ লক্ষ টাকা করার কথা বলা হয়েছিল। বহুজাতিকদের বাঁচাতে তাও করা হয়নি। দানব বীজ কোম্পানিগুলির বিক্রি করা বীজের ব্যর্থতার ফলে ফসল না ফললে ক্ষতিপূরণ দেবার ক্ষেত্রে দ্রুত এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফয়সালা করার (Fast Track Arbitration) কোনও ব্যবস্থাও রাখা হয়নি। ফলে 'বোলগার্ড-১' নামক বিটি তুলার ব্যর্থতা (Crop Failure) মনস্যান্টো মেনে নিয়ে, আরও দামী 'বোলগার্ড-২' চালাতে চাইলেও তার কাছ থেকে হাজার হাজার কৃষকের মৃত্যুর জন্য এক পয়সা ক্ষতিপূরণও আদায়ের সুযোগ নেই। 'ব্যর্থতা' স্বীকার করার আগেই তারা মুনাফা চেঁচেপুছে নিয়েছে ৮–১০ বছরে। বীজের দাম হয়ত ২০০ টাকা। কিন্তু চাষির যে দশ হাজার টাকার সার, কীটনাশক, ডিজেল নষ্ট হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ কে করবে? ভোক্তা সুরক্ষা আইন এক্ষেত্রে প্রায় নখদন্তহীন।

৭. ছোট চাষি প্যাকেটে করে বীজ বিক্রি করলেও এই আইনের আওতায় পড়বে। আমাদের দেশে কয়েক হাজার ফসল বা সবজির চাষ হয়, যার বীজ কেউ কোনওদিন তৈরি করেনি। অথচ এই আইনে সে সবও 'গুণমান' ও 'শুদ্ধতার' নামে কৌটো বন্দী হয়ে বহুজাতিকদের পণ্যে পরিণত হবে।

৮. এই বিল 'Protection of Plant Variety & Farmers' Right Act'-এর সম্পূর্ণ বিরোধী, যা বহুজাতিক কৃষিপণ্য ও বীজ ব্যবসায়ীদের স্বার্থের বিরোধী ও তাদের চক্ষুশূল। সেইজন্য তাদের চাপে তড়িঘড়ি এই বিলকে আইনে পরিণত করবার অপচেষ্টা।

৯. কেবল কৃষক নয়, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাও এতে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। সাধারণ কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর ঘরে ঢুকে যেভাবে বীজ পরিদর্শকরা তল্লাশি

চালাতে পারবে বলে আইনে বলা হয়েছে, তা অবশ্যই নানা কালা কানুনকে মনে করায়। যাতে কোনওভাবেই বহুজাতিকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হয় বীজ ব্যবসায় ক্ষেত্রে, তাই এই ষড়যন্ত্র।

১০. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বীজের মূল্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়টির প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ২০০৬ সালে এম আর টি পি কমিশন বিটি তুলার দাম কমাতে নির্দেশ দিলে অন্ধ্র সরকার তা কমায়। কিন্তু কোম্পানি হাইকোর্ট থেকে স্থগিতাদেশ নিয়ে আসে। এই ধরনের ঘটনা বহুবার ঘটেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও মূল্য বা রয়্যালটি নিয়ন্ত্রণের কোনও ধারা-উপধারা এই বিলে রাখা হল না।

নীচের সারণিতে দেখুন ২০০৮-০৯ সালে অন্ধ্রপ্রদেশে একই ফসলের বিভিন্ন বীজের দামে (ফাটকাবাজির মত) কিভাবে বিপুল পার্থক্য হয়েছে—

সবজি	দাম (টাকা/কেজি)
টমেটো	৪৭৫ থেকে ৭৬,০০০
বেগুন	১,৭৬০ থেকে ৯,৭৩০
ঢ্যাড়শ	১৭০ থেকে ১,৪২৫
স্কোয়াশ	২,৩৫০ থেকে ৫৫০০
বীট	৭২৩ থেকে ২,৬৪০
করলা	৩৫০ থেকে ৪,৩০০
লাউ	১,০৫০ থেকে ৩,৫৬০
বাঁধাকপি	৫,৮৪০ থেকে ২২,২৬০
ক্যাপসিক্যাম	৩,৬৭০ থেকে ৬৫,২০০
গাজর	৫৯০ থেকে ৩,৭০০
ফুলকপি	৫,৮১০ থেকে ৩৯,৭৪৫
বীন	৭২ থেকে ২২,৫০০
ধনে	৭০ থেকে ২৭০

সূত্র : http://www.aphorticulture.com

শেষের কথা

ভারত-মার্কিন কৃষি জ্ঞান উদ্যোগ (AKI), দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব, বীজ আইন—সব একই সূত্রে গাঁথা। ভারতবর্ষের কৃষিকে ধ্বংস করে, তাকে সাম্রাজ্যবাদী মুনাফার মৃগয়াভূমিতে পরিণত করার ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র। ষড়যন্ত্র দেশের কোটি কোটি মানুষকে হত্যা করার। গুদামে লক্ষ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য পচিয়ে গরিব মানুষকে অভুক্ত রাখা, শুধুমাত্র ব্যবসার স্বার্থে দেশের জল, জঙ্গল, জমি অবাধে লুণ্ঠন করার, রত্ন প্রসবিণী খনিগুলি দেশি-বিদেশি কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেবার।

বিদেশে বাতিল বিপজ্জনক পরমাণু চুল্লী ভারতের মাটিতে বসিয়ে জীবন ও জীবিকাকে আক্রান্ত করার পাকাপাকি ব্যবস্থা হতে যাচ্ছে।

কৃষিক্ষেত্রের ওপর সরকারি মদতে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার এই বীজ আইন। কেবল কৃষিজীবী মানুষ নয়, ব্যাপক সংখ্যক সাধারণ মধ্যবিত্ত, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, হস্তশিল্পী মানুষকে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে—ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে, আপনার নিজের পুত্র কন্যার স্বার্থে।

যেসব লেখার সহায়তা নেওয়া হয়েছে :

১। খিদের রাজনীতি ও অর্থনীতি—অভী দত্ত মজুমদার (ফামা)।
২। কৃষিকথা—শুভেন্দু দাশগুপ্ত (নাগরিক মঞ্চ)।
৩। সরকারের নতুন কৃষিনীতি—ঐ (ঐ)।
৪। ভারতীয় কৃষি ও কৃষক—সন্তোষ রাণা (এককমাত্রা)।

[বর্তমান প্রবন্ধটি গণবার্তা পত্রিকার ১৪১৭/২০১০ শারদীয় সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়]